International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 210-217
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.213

রাঢ় বাংলায় লোকধর্ম ও মিশ্র সংস্কৃতির বাহকরূপে পিরানি বা মহিলা সুফি সাধিকার মাজার

মুন্সী মহ: সাহেবুর রহিম
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 16.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the tradition of folk religion and syncretic culture of Rarh Bengal, the shrines (mazars) of Pirani or female Sufi saints are considered important socio-religious centers. Just as male Pirs played a significant role in the history of Sufi practices, many female mystics also earned the respect and faith of common people through their spiritual pursuits, love for humanity, and service to society. Although detailed historical records about their lives are scarce in Rarh Bengal, their influence and popularity are clearly reflected through folklore, oral traditions, and field studies.

At the shrine of Pirani Halima Bibi located at Sekhdanga near Sahisnara village in Bankura district, it is mainly Hindu villagers who offer daily prayers by lighting incense and candles, and offerings (shirni) are made during the Urs in the month of Muharram. At the shrine of Joran Bibi in Hilora village of Murshidabad, a seven-day fair is held every year on the last Thursday of the month of Ashar, where thousands of Hindu and Muslim devotees gather. In the Paikar region of Birbhum, the shrine of Konkoni Bibi has created a unique atmosphere of communal harmony between Hindus and Muslims. In Radhakrishnapur village of Purba Bardhaman, Urs and fairs are organized in the month of Phalgun in memory of Pirani Khadija Bibi, where many people come to make vows. Similarly, at the shrine of Pirani Khadem Bibi in Khajurdihi of Katwa, devotees offer incense and candles, tie stones to trees, and dedicate clay horses while praying for the fulfillment of their wishes.

The shrine of Champa Bibi in Birbhum stands as a unique symbol of Hindu-Muslim harmony. According to local belief, a Hindu ascetic named Champabati later attained spiritual fame, and the shrine established in her memory continues to attract devotees from both communities who offer prayers and devotional offerings.

Overall, it is evident that these Pirani and female Sufi saints of Rarh Bengal were not confined only to religious practices; they stood beside the poor, oppressed, and marginalized, spreading the message of humanity. Even today, gatherings around their shrines, Urs, and fairs keep alive an important tradition of communal harmony, folk belief, and regional culture.

Keywords: Pirani, Sufi, Pir, vow (manat), Urs, Mazar, Khanqah, Astana

মুসলিম সিদ্ধ পুরুষই সুফি। বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড নয়, প্রেমভক্তি দিয়ে আল্লার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা সুফি মতবাদের লক্ষ্য। এগারো শতক থেকেই সুফিবাদ বাংলার জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। যা মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কাব্য ও সংগীতের সমঝদার মধ্যযুগের তান্ত্রিক বাঙালি সুফিবাদের প্রভাব এড়াতে পারেনি, এড়াতেও চায়নি। সুফিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে- বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম একটি বিশ্বাসের প্রচলন হয়। প্রাচীন যুগের বাংলায় তন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ সহজাত। বাঙালি তার জাগতিক কল্যাণের আশায়

সুফিদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। সুফিবাদ কেবল আধ্যাত্মিক চর্চার ক্ষেত্রেই নয়, বরং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং জনসেবামূলক চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও একটি কার্যকর ও ইতিবাচক প্রভাব রেখেছিল।

বাংলায় ইসলামের আলো ছড়িয়েছিলেন সুফিরাই। দরগা মাজার হয়ে উঠেছিল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি।[১] পিরদের আধ্যাত্মিক অলৌকিক শক্তি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষদের আকর্ষণ করেছিল। তাঁরা জাগতিক সমস্যার সমাধান করতে ও ভক্তের মনস্কামনা পূরণ করতে পারেন এমন বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বহু দূর থেকে মানুষ পিরের থানে মানত করতো এবং মাজারে এসে আচার পালন ও দোয়া দরুদ পাঠ করত।[২]

সাধারণ মানুষ সুফিদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। সুফিদের আস্তানাকে বলা হয়- ‘খানকাহ’ বা খানকা। সাধারণ অর্থে বাসস্থান। এখানে শিষ্যরা সমবেত হত এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করত।[৩] পিরেরা সমবেত হয়ে শিষ্যদের মধ্যে নিজেদের মুখনি: সৃত বাণী প্রচার করত। সুলতান ও রাজকর্মচারীদের সহায়তায় বাংলার প্রত্যন্ত লোকালয়ে খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করা হত। একটি আদর্শ খানকায় মসজিদ, মাদ্রাসা, লঙ্গরখানা, মুসাফিরখানা, চিকিৎসালয় এবং গ্রন্থাগার থাকত। খানকাগুলোতে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের প্রবেশের অধিকার ছিল। মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং খানকাহর সুফিসাধকগণ ধর্ম প্রচার করতেন।[৪] খানকায় দু:স্থ ও দরিদ্রদের ভিড় থাকত। এরা ছিল একাধারে অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং সেন আমলের বৈদিক বর্ণবাদের শিকার। অন্যদিকে দেখা যায় পিরেরা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে চিকিৎসা করেছেন। মাদ্রাসা খুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। লঙ্গরখানা খুলে ক্ষুধার্তকে অন্ন দিয়েছেন যেমন জাফর খাঁ গাজী, পিররা প্রচুর দিঘি খনন করেছেন, মসজিদ নির্মাণ করেছেন, অসংখ্য পাকা সড়ক নির্মাণ করেছেন যেমন–খান-ই-জাহান। সুলতান বারবাক শাহের আমলে বন্যার কবল থেকে রাজধানী রক্ষার কাজে দরবেশ যোদ্ধা নামে খ্যাত শাহ ইসমাইল গাজী ব্রিজ নির্মাণে ভূমিকা রাখেন।[৫] ফলে পিরদের এই জনকল্যাণময় গুণাবলি অমুসলিমদেরও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছিল এবং তাঁরা পিরদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

ইসলাম ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় লৌকিক ইসলাম নামে পরিচিত হয়। কোরান বা শাস্ত্রীয় ইসলামে এটিকে ‘বেদাত’ আখ্যা দেওয়া হয়।[৬] এই লৌকিক ইসলাম বিভিন্ন দেশে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে এর কারণ ভিন্ন সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় ইসলামের বিশুদ্ধতাকে হারিয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে। তাই দেখা যায় বঙ্গের লৌকিক ইসলামের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পারস্যের লৌকিক ইসলামের কোন মিল নেই। আবার মালয় উপদ্বীপের লৌকিক ইসলামের সঙ্গে বাংলার বা পারস্যের লৌকিক ইসলামের পার্থক্য আছে। সাধারণ মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য্য, বৈশিষ্ট্য ও সুফি পিরদের কেরামতি ও বুজরুকির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা প্রাচীন রীতিনীতি আচার ব্যবহার কুসংস্কার প্রভৃতি পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেনি। উত্তরাধিকার সূত্রে ধরে রেখেছিল।[৭] এই ধরনের সংস্কৃতি লৌকিক ইসলামে রূপান্তরিত হয়।

ইসলামের সুফি মতবাদ থেকে পিরবাদের উদ্ভব। পির শব্দের অর্থ হলো আধ্যাত্মিক পরিচালক বা পথ প্রদর্শক।[৮] বাংলায় পিরবাদ একটি স্বতন্ত্র উদার ধর্মবিশ্বাস। বাংলায় পিরবাদে মুরিদ বা শিষ্য দেখা যায়। ভক্ত বা শিষ্যেরা নিজের আয়ের একটা অংশ পিরকে নজরানা বা সেলামি হিসেবে দিয়ে থাকেন। এমনও দেখা যায় নিজে না খেয়ে কষ্ট করে অর্থ জমিয়ে পিরকে নজরানা (অর্থ ও বস্তু উপহার) দিয়ে থাকেন। এর থেকে পিরের প্রতি শিষ্যের ভক্তি ও সম্মানের দিকটি ফুটে ওঠে। পাশাপাশি এইসব দেখে হিন্দুদের মধ্যেও মানসিক বা মানত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পিরকে অলৌকিক পুরুষ বলে বিশ্বাস করা হয়। পির সাহেবেরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তিনি ভবিষ্যৎবাণী করতে করে দিতে পারেন, আশীর্বাদ করতে পারেন, মৃত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারেন,

নিঃসন্তানকে সন্তান দান করতে পারেন, মুরিদের মনোস্কামনা পূর্ণ করে দিতে পারেন, মুরিদ বা শিষ্যকে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ বা মিলন করে দিতে পারেন, জরা ব্যাধি কবলিত শরীরে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন, ব্যবসায় উন্নতি করে দিতে পারেন- এই সকল বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ করে মুরিদগণ। এই সকল বিশ্বাস থেকে পির সম্বন্ধীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায় যেমন মৃত পিরের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, আতর গোলাপজল ছড়ানো, লোবান (ধুপ জাতীয় সুগন্ধি দ্রব্য) ও বাতি জ্বালানো, কবরের উপর সিন্দুর লেপন, ফুল প্রদান, মৃত বা জীবিত পিরের নামের শিরনি (মিষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য), চিরাগি (আলো দান) এবং পিরের নামে উৎসর্গ করা খাবার (তবররুক বা প্রসাদ) সকলের মধ্যে বিতরণ করা প্রভৃতি। অনেক দরগাতে মাটির ঘোড়া দেখা দিতে দেখা যায়।[৯]

সাধারণ মানুষের বিশ্বাস পিরের দরগাতে ঘোড়া মানত করলে খোঁড়া সন্তান যেমন জন্মায় না তেমনি খোঁড়া সন্তান আরোগ্য লাভ করে। রাঢ় বাংলায় পিরপুকুরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পির পুকুরে স্নান করলে নানাবিধ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে বাঙালি মুসলমানরা বিশ্বাস করেন। উর্বরতা শক্তির ধারণা ও পিতৃপুরুষ উপাসনা এই পিরবাদের ক্রমবিকাশের গভীরে নিহিত ছিল।[১০]

পিরবাদের মাধ্যমে এদেশীয় লৌকিক বিশ্বাস মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছে। পিরের শিরনি দেওয়ার সময় গাছের তলায় ইটের উপর কলাপাতায় শিরনি পিরের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ রেখে তারপর বিতরণ করা হয়। এর সঙ্গে হিন্দু মন্দিরের প্রসাদের মিল লক্ষ্য করা যায়। মাতৃকা পূজা, পশু পূজা, বৃক্ষ পূজা, পিতৃপুরুষ পূজা, আত্মায় বিশ্বাস, জন্মান্তরবাদ- সবকিছুর পিছনে ছিল সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের মিলিতরূপ। এই যোগসাধন বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথপন্থী, সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়ার মধ্য দিয়ে যেমন বিকাশ লাভ করেছে তেমনি ইসলামীয় সুফিবাদ বাংলার পিরবাদ-এ পরিণত হয়েছে।[১১]

হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনের দৃষ্টান্ত হলো পির পূজা। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন ভারতীয় মুসলমান সমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল পির পূজা। ‘পির’ কথার অর্থ ‘প্রাচীন’। পির-মুরিদির সম্পর্কের মধ্যে গুরু-চেলা সম্বন্ধের নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা পিরের মধ্যে তান্ত্রিক গুরুর মিল খুঁজে পায়। তাদের সমাধি বা দরগা সমূহের মধ্যে বৌদ্ধ যুগের চৈত্য ও স্তূপের সাদৃশ্য দেখা যায়। মুসলমান সাধকগণ ইচ্ছা করেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহে দরগা ও খানকা নির্মাণ করতেন।[১২] ধীরে ধীরে পিরের মাজারগুলি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বন্দনার বা পূজার স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মমঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যেও পিরের দরগা স্থান পেয়েছে।[১৩] মাজারে সুখে দুঃখে, আপদ-বিপদে, অসুখে-বিসুখে মিষ্টান্ন দেওয়া হত। রোগমুক্তির আশায় সেখানে প্রার্থনা করা হত। হিন্দুরা প্রথম থেকেই এই ভোগ দান প্রথায় আস্থাশীল ছিল। সুতরাং মুসলমানদের মতো তারাও এ ব্যাপারে যত্নশীল ছিলো।[১৪] বৌদ্ধদের স্তূপ নির্মাণের মতো হিন্দুরা প্রতিমার উপর মঠ নির্মাণ করতো, একই রকম ভাবে মুসলমানরা পিরের দরগার উপর গম্বুজ নির্মাণ করতো। মঠে মহন্ত ও গোঁসাই এর উপস্থিতির মত পিরদের মাজার শরীফে থাকতো খাদিম বা মোজাব্বের। বাংলায় মুসলমানেরা সত্যপিরের পুজো করতো, আর হিন্দুরা সত্যনারায়ণের। মূলত এই দুটি পূজা-পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের জ্যোতিষী বিদ্যা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। জ্যোতিষীদের পরামর্শক্রমে যে কোন প্রয়োজনীয় কাজ করা হতো। আজিজুর রহমান মল্লিক লিখেছেন– “বৈবাহিক সম্পর্কের বেলাতেও বংশ কুলজী, ধর্ম আচার নীতি ইত্যাদি বিবেচনা করা হতো। এবং সমস্ত বৈবাহিক সম্পর্ক জ্যোতিষীর পরামর্শক্রমেই সম্পন্ন হতো।”[১৫] বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান হিন্দু-সমাজের পুরানো উৎসবে যোগদান বা বিভিন্ন প্রথাকে মেনে চলত। ১৯০৯ সালের Imperial Gazetteer এ উল্লেখ রয়েছে “It was until recently, the regular practice of low-class

Muhammedans to join in the Durga Puja and other Hindu festivals"[১৬] তাছাড়া বাঙালী মুসলমান সমাজের বিরাট অংশ হিন্দু পঞ্জিকা মানত, শীতলা ও মনসা পূজা করত। মুসলমান মেয়েরা সিথিতে সিন্দুর পরত বা ধান রোয়ার সময় গ্রাম্য দেবতাকে পূজা দিয়ে কাজ শুরু করত।[১৭]

সুফি-পির-আউলিয়াদের জগতে অনেক সুফি নারী সাধিকাও আছেন যাঁরা সারাজীবন ঈশ্বর আরাধনাতেই কাটিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে মহিলা পির বা পিরানি বলা হয়ে থাকে। কেউ সংসারী হয়েও নিজেকে উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর দ্বীনের পথে, কেউ বা সংসার ছেড়ে একাকী জীবন কাটিয়েছেন। রাঢ় বাংলায় পিরানিদের সম্পর্কে খুব বেশি বিস্তৃত জানা না গেলেও অনেকের জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনা বা কেরামতির কথা জানা গেছে। তাই তাঁরা সাধারণ মানুষের মনে শতাব্দীকাল ধরে মনের মণিকোঠায় স্থান লাভ করে রয়েছে। যেমন—

১. হালিমা বিবির মাজার:

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার সহিসনাড়া গ্রামের কাছে সেখডাঙ্গায় হালিমা বিবি নামে এক পিরানির মাজার আছে। সেখডাঙ্গায় যারা বসবাস করে তাঁরা সবাই হিন্দু। মহিলারা প্রতি সন্ধ্যায় মাজারে ধূপ মোমবাতি জ্বালায় ও শ্রদ্ধা জানায়। রাত্রিবেলায় খিড়কির দরজায় এই গ্রামের গৃহস্থরা তালা দেয় না। তাঁদের বিশ্বাস পিরানির আশীর্বাদে কোন বিপদ হবে না।[১৮] বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই পিরস্থানে শিরনি দেওয়া হয়। চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী মহরম মাসের ৭ তারিখ এখানে পিরানির উরস পালিত হয়।

২. জরান বিবির মাজার:

মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি খানার অন্তর্গত হিলোড়া নামক গ্রামে জরান বিবির মাজার আছে। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শেষ বৃহস্পতিবার তাঁর নামে মেলা হয়। সাত দিন ধরে মেলা চলে। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ চাল-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে জরান বিবির-আত্মার প্রতি সম্মান জানান। সকলের কাছে ঐ দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ঐ সময় গ্রাম্য এলাকা উৎসবের আকার ধারণ করে। খিচুড়ি ভোগ হয় ঐ তারিখে। শোনা যায় জরান বিবি এক মহীয়সী মহিলা আপন সাধনাবলে অলৌকিক কাজ করতে পারতেন। তাঁর যোগ-সাধনায় সন্তুষ্ট অনেকে তাঁকে বহু সম্পত্তি দান করেছিলেন। ঐ দিন মাজারে বহু (প্রায় ৭০০০-৮০০০) ভক্তের সমাবেশ হয়।[১৯]

৩. কনকনি বিবির মাজার:

বীরভূম জেলার পাইকর এলাকায় লাহাপাড়া ও রবিদাস পাড়ার সঙ্গমস্থলে কনকনি বিবির মাজার রয়েছে। সকলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পাইকর অঞ্চলে ফকিরদের প্রচারিত একটি গান এইরূপ:-

মন্দির আর মসজিদে হয় মানুষের সমাবেশ/
ভোরের আজান সন্ধ্যায় শাঁখ শুনতে লাগে বেশ।/
এক সাথে থাকি মোরা হিন্দু-মুসলমান/ প্রতিমা নিরঞ্জন আর মহরম খেলায়/ হাতে হাত রেখে চলি পায়ে পায়/
পূজা আর ঈদ্ শেষে করি মোরা আলিঙ্গন।/
মোদের এ মৈত্রী বাঁধন।/
যায় না ভাঙা জানিও নিশ্চয়।[২০]

৪. খাদিজা বিবি

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে পিরানি খাদিজা বিবির মাজার আছে।[২১] এই ধর্মপরায়ণা সাধ্বী রমণী খুবই প্রসিদ্ধ কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রতি বছর তাঁর তিরোধান উপলক্ষে ফাল্গুন মাসে স্মরণ উৎসব পালিত হয়। বহুলোকের সমাবেশ হয় এবং উরস-উৎসব-মেলা হয়। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় মেলাটি প্রায়

৮০–৯০ বছরের পুরোনো। মাজারটি রাস্তার ধারে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে খোলা অবস্থায় রয়েছে।[২২] মেলায় সকলেই অংশগ্রহণ করেন, আমোদ-প্রমোদ হয়, বহু দোকান পাট বসে, বেচাকেনা হয়।

৫. পিরানি খাদেম বিবি:

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার খাজুরডিহি মেন্টাল হসপিটালের কাছাকাছি খাদেম বিবি নামের এক পিরানির আস্তানা আছে। উনার বৃত্তান্ত সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও স্বপন কুমার ঠাকুর "রাঢ় কথা" বই-এ উল্লেখ করেছেন তিনি উনিশ শতকের সাধিকা ছিলেন।[২৩] তাঁর উরস উপলক্ষে ১৫ই মাঘ উৎসব মেলা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ধূপ ও মোমবাতি জ্বালায়, গাছে ঢিল বাঁধে ও আস্তানায় মাটির ঘোড়া দিয়ে মনস্কামনা পূরণের জন্য পিরানির কাছে মানত করে।

৬. চম্পবিবির মাজার:

বীরভূম জেলায় অবস্থিত চম্পবিবির মাজার। দুর্গাপুর ইলামবাজার বাসে চেপে সখের বাজারে নেমে পশ্চিম দিকে একটু এগিয়ে গেলে গোরুর হাটের পাশেই রয়েছে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ মাই চম্পাবিবির মাজার। পশুহাটে ঢোকার আগে দুর্গামন্দির, যেটির প্রতিষ্ঠাতা রায়পুরের জমিদাররা এবং এখানকার পশুহাট ও মাজার এঁদেরই দান।[২৪] ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে বর্তমান খাদিম ও অন্যান্যদের কাছ থেকে চম্পাবিবির এক জনশ্রুতি জানা যায়– আর পাঁচজনের মতো, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে চম্পাবতীর পিতা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তীর্থদর্শনে গিয়ে পথের মাঝে পড়ে যান ডাকাতদের কবলে। প্রাণ বাঁচাতে পিতা কন্যার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। অসহায় হিন্দু যুবতী চম্পাবতী বনের মাঝে এক ফকিরের সন্ধান পান। তার মুখে সব শুনে মেয়ের মত আশ্রয় দেন চম্পাবতীকে। চম্পাবতী ফকিরবাবার সাথে কঠোর তপস্যা করেন। ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করেন তপস্বীরূপে। ফকিরের সাথে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে তারা বর্তমান সুখবাজার পশুহাটের কাছে বসবাস শুরু করেন। এই জায়গার পূর্ব নাম ছিল চৌপাহাড়ীর জঙ্গল।[২৫] এদিকে চম্পাবতীর বাবা ঘুরতে ঘুরতে তাদের আস্তানায় হাজির হলেও তপস্বী ফিরে যেতে চাননি। ক্রুদ্ধ পিতা মেয়ের সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং পরীক্ষা করার জন্য চম্পাবতীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। আশ্চর্য হয়ে পিতা লক্ষ করেন চম্পাবতী সম্পূর্ণ অক্ষত, আগুন তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তিনি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বাসনা ত্যাগ করেন। এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব না থাকলেও তিনি যে তপস্বী হয়েছিলেন এবং সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তাঁর গুরুত্ব ছিল একথা অনস্বীকার্য। তাঁর মাজারের পাশে রয়েছে পুকুর। মাজারের পাশে দুটি ফলক রয়েছে, ফলকদুটির লেখা কিছুটা অস্পষ্ট হলেও বাম দিকের স্মৃতি ফলকে লেখা–"শ্রীশ্রী তাপসী পীর মাইচম্পাবিবির স্মরণার্থে"। আবার ডানদিকের স্মৃতি ফলকে[২৬] লেখা আছে–"তাপসী মাইচম্পাবিবির স্মরণার্থে, হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত"- এই লেখা থেকে বোঝা যায় শ্রী শ্রী, তাপসী শব্দগুলি সবই হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ, আবার- ৭৮৬, পির, বিবি, মাজার- এগুলি সবই মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গ। সুতরাং ফলকগুলোই হলো সম্প্রীতির নজির। এখনও প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে ঢোল বাজিয়ে আসেন হিন্দু-মুসলিমরা বাতাসা পায়েস ভোগ দেন। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শেষ বৃহস্পতিবার পায়েস তৈরি হয়। প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি পেতে ভক্তি ভরে হিন্দু-মুসলিম সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৭. লালবিবির মাজার

লালবিবি রাঢ় বাংলার গ্রামীণ সুফি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত এক মহিলা সাধিকা বা পিরানি হিসেবে লোকসমাজে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামে তাঁর নামে ছোট ছোট মাজার বা আস্তানা দেখা যায়। স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী লালবিবি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার

অধিকারিণী এক সুফি সাধিকা। তাঁর জীবনের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না, তবে লোককথা ও জনশ্রুতির মাধ্যমে তাঁর স্মৃতি গ্রামীণ সমাজে সংরক্ষিত রয়েছে।

গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, লালবিবির আশীর্বাদে রোগ-ব্যাধি ও নানা বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সেই কারণে বহু মানুষ তাঁর মাজারে গিয়ে মানত করেন এবং ধূপ, মোমবাতি, ফুল বা শিরনি নিবেদন করেন। কোথাও কোথাও গাছের ডালে কাপড় বা সুতো বেঁধে মানত করার রীতিও প্রচলিত। তাঁর উরস উপলক্ষে ছোটখাটো উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হয়, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই মাজারকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় আচরণ ও লোকবিশ্বাস গড়ে উঠেছে তা বাংলার গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।[২৭]

৮. সতীবিবির মাজার

সতীবিবি বাংলার লোকবিশ্বাসে এক মহিলা সুফি সাধিকা বা পিরানি হিসেবে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অঞ্চলে তাঁর নামে মাজার বা ছোট থান দেখা যায়। জনশ্রুতি অনুযায়ী সতীবিবি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মানুরাগী ও তপস্বী স্বভাবের নারী, যিনি সাধনা ও আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে মানুষের নানা বিপদ থেকে রক্ষা করতেন।

গ্রামীণ সমাজে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল যে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদে মানুষের রোগমুক্তি, পারিবারিক শান্তি ও মনস্কামনা পূরণ হয়। সেই কারণে বহু মানুষ তাঁর মাজারে ধূপ-ধুনো, ফুল, চাদর বা শিরনি নিবেদন করেন। কিছু স্থানে তাঁর তিরোধান দিবস বা উরস উপলক্ষে স্থানীয় মেলা ও ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়, যা বাংলার লোকধর্মের সমন্বয়ধর্মী চরিত্রকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।[২৮]

সুতরাং রাঢ় বাংলার সুফিভাবাশ্রয়ী পির পিরানি ফকিররা এদেশে কেবল ধর্ম প্রচারই করেননি। তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণীর, সামাজিকভাবে নির্যাতিত শ্রেণীর, মানবিকভাবে অবহেলিত শ্রেণীর, রোগশোকে পীড়িত দীনদুঃখী মানুষের সাথে মিশেছেন ও পাশে থেকেছেন। তাদের নিঃস্বার্থভাবে আশ্রয়দান, অন্নদান, সেবা শুশ্রুষা করেছিলেন। তাঁদের উদারমানবতা, ভোগহীন জীবনাদর্শ ও লোকহিত কর্মপন্থা এসব মানুষকে মুগ্ধ, মোহিত ও আকৃষ্ট করেছিল, এখানকার মানুষের মনে চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস -সংস্কার, আচার-বিচার ইত্যাদির প্রধান নির্দেশক ও রূপকার হয়ে উঠেছিলেন সুফি পিররা। দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব পির-দরবেশগণের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না। প্রমাণের অভাবে তাঁদের ইতিহাস প্রায় মুছে গেলেও, কল্পনানির্ভর জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি বা কথাকাহিনী তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাঁদের স্মৃতিবাহিত মাজার, দরগাহ, হাজত, মানত, শিরনি ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁরা হাজার হাজার ভক্তের স্মৃতির মধ্যে জীবিত আছেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস- তাঁদের আত্মা অমর, তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় ও বরণীয়। পির সুফিদের মাজারকে ঘিরে আজও আমাদের দেশে উরস, উৎসব মেলার আয়োজন করা হয়। মাজারে চাদর চড়ানো, কাওয়ালি গানের আসর, মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সব চাহিদার সব কিছুই এই মেলায় পাওয়া যায়। মেলা মিলনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অসংখ্য মানুষ অত্যন্ত ভক্তি, আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে এখানে অংশগ্রহণ করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ ভীড় জমায়।

তথ্যসূত্র:

১. ইসলাম, ড. সা'আদুল: বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, দ. চব্বিশ পরগণা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৪. দ্রষ্টব্য; Kabir: The Apostle of Hindu-Muslim Unity, Md. Hedayatullah, Delhi, 1977, pp. 50–51.

২. আহমদ, ওয়াকিল: বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বইপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৬, পৃ. ১৯–২০.

৩. ভট্টাচার্য, আনন্দ: সুফি আন্দোলন বঙ্গে বহির্বঙ্গে, আশাদীপ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, সংস্করণ আগস্ট ২০২২, পৃ. ১৮৮–১৮৯.

৪. Sinha, Sutopa (Ed.): Journal of Islamic history and culture of India, Volume–I (2012), (Dey, Amit: Sufism and Society in Medieval India), Department of Islamic History and Culture, University of Calcutta, 2015, p. 169.

৫. সুজাউদ্দিন, সেখ: বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে সূফীদের ভূমিকা, Pratidhwani the Echo (A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science), Volume-X, Issue-V, October 2022, pp. 121-129.

৬. হক, মুহম্মদ এনামুল: বঙ্গে সূফী-প্রভাব, আশাদীপ পাবলিকেশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১২৬-১২৭.

৭. বসু, ড. নির্মলকুমার: হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪২–১৪৭.

৮. Roy, Asim: The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Princeton University Press, Princeton, USA, 1983, p-42.

৯. বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও দেখা যায়। দ্রষ্টব্য; করণ, ড. সুধীরকুমার: সীমান্ত বাংলার লোকযান, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ১ম সং, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০-৭২.

১০. Bandyopadhyay, Gouri Sankar: Ancestral Cult in Bengal: A Comparative Study, Touchstone Publication, Kolkata, WB, 2011, pp. 19–27.

১১. শরীফ, আহমদ: মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, পৃ. ৫৫.

১২. সরকার, জগদীশ নারায়ন: মধ্যযুগীয় বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ৩৩.

১৩. তদেব, পৃ. ৩৪–৩৬.

১৪. ১৪. মল্লিক, আজিজুর রহমান: ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ১৪-১৫.

১৫. তদেব, পৃ. ২৪-২৬.

১৬. Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Bengal, Vol. I, Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1909, p. 48.

১৭. Sarkar, Sumit, Swadeshi Movement in Bengal, 1903–1908, People's Publishing House, New Delhi, 1973, pp. 407–408.

১৮. চক্রবর্তী, গিরীন্দ্রশেখর (সম্পা.): বাঁকুড়ার খেয়ালী সাহিত্য পত্রিকা, রজতজয়ন্তীর বর্ষপূর্তি স্মারক সংকলন ২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮–১৩৪.

১৯. দাস, গিরীন্দ্রনাথ: বঙ্গের পির পিরানি কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯.

২০. দাস, দীনবন্ধু: দর্শন, পৌষ সংক্রান্তি ১৪০৩, দ্রষ্টব্য: দাস, গিরীন্দ্রনাথ: বঙ্গের পির পিরানি কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯–৬০.

২১. দাস, গিরীন্দ্রনাথ: বঙ্গের পির পিরানি কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪–৭৫.

২২. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা। সহায়তা করেছেন সৈয়দ আতাউর রহমান, বড় পলাশন, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান।

২৩. ঠাকুর, স্বপন কুমার: রাঢ় কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬.

২৪. চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রনাথ (সম্পা.): রাঢ় ভাবনা পত্রিকা, দ্বাদশ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা ৫-৬.

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৮–১০.

২৬. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, তথ্য দাতা বর্তমান খাদিম আনিসুর রহমান।

২৭. Abdul Karim, Social History of the Muslims in Bengal, Asiatic Society of Pakistan, 1959, Dhaka, pp. 210–211.

২৮. Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, (Princeton: Princeton University Press, 1983), pp. 24–30.